কালের কণ্ঠ

আপডেট : ২৩ মার্চ, ২০১৯ ২২:৪৯

দেশে উচ্চশিক্ষায় আমাদের করণীয় কী

মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী

বাংলাদেশে দ্বাদশ শ্রেণি-উত্তর শিক্ষাকে উচ্চশিক্ষা হিসেবে ধরা হয়ে থাকে। এর সঙ্গে নানা চরিত্রের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেমন– জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত ডিগ্রি কলেজের সংখ্যা সরকারি ও বেসরকারি মিলিয়ে দুই হাজার ২৪৯। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ৪৫টি, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ১০৩টি। এ ছাড়া আলিয়া ও কওমি মাদরাসায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাক্রম রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত সরকারি-বেসরকারি ৭৭০টির মতো কলেজে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর প্রগ্রাম ১৪৫টি কলেজে রয়েছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১২ লাখ ৩৭ হাজার ১২। পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা এবং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়গুলোতে প্রকৃত শিক্ষার্থীর পরিসংখ্যান আমাদের হাতে নেই। তবে ধারণা করা হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন ধরনের সরকারি-বেসরকারি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ লাখের অধিক শিক্ষার্থী রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রকৌশল, মেডিক্যাল, কৃষি ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মানের তারতম্য রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকার বাইরে নতুন প্রজন্মের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যোগ্য ও অভিজ্ঞ শিক্ষকের সংখ্যা আশানুরূপ নেই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজগুলোতে শিক্ষকের সংকট বহু পুরনো। অভিজ্ঞ এবং উচ্চতর গবেষণাসমৃদ্ধ শিক্ষকের সংখ্যা হাতে গোনা। মাদরাসাগুলোর পরিস্থিতি খুবই নাজুক। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে গোটা দশেক বিশ্ববিদ্যালয় মোটামুটি মানসম্মত ডিগ্রি দিচ্ছে। বাকিগুলোর বিরুদ্ধে সনদ বিক্রির অভিযোগ সর্বত্র উচ্চারিত হচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষায় অংশ নেওয়া বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই মানসম্মত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়। দেশে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে যে আমাদের উচ্চশিক্ষা মোটেও আন্তর্জাতিক মানের ধারেকাছেও নেই। সে কারণেই বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আন্তর্জাতিকভাবে কোনো র‍্যাংকিংয়ে স্থান করে নিতে পারেনি। এমনকি প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা বুয়েট অথবা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই তালিকায় উঠে আসতে পারেনি। যদিও আমাদের দেশ থেকে অনেক ডিগ্রিপ্রাপ্ত

প্রকৌশলী, কৃষিবিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থী উন্নত দেশে উচ্চতর গবেষণা, শিক্ষকতা ইত্যাদিতে খ্যাতি অর্জন করছেন। এ ছাড়া উন্নত দেশগুলোতে উচ্চতর শিক্ষার জন্য বাংলাদেশ থেকে যাওয়া প্রচুর শিক্ষার্থী বেশ সুনামের সঙ্গেই শিক্ষাজীবন শেষ করছেন এবং অনেকেই সেসব দেশে গবেষণা ও অধ্যাপনায় যুক্ত হয়ে ভালো ফল দেখাচ্ছেন। এর মাধ্যমে যে বিষয়টি পরিষ্কার তা হচ্ছে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পেলে মেধার উচ্চতর স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম। কিন্তু আমরা বহু ধরনের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি করায় কোনোভাবেই সেগুলোর ওপর মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারিনি। বাংলাদেশের জন্য তা মোটেও সহজ কাজ নয়। লাখ লাখ শিক্ষার্থীকে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ভর্তি করা হলেও সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর বেশির ভাগই উচ্চশিক্ষাকে খুব একটা ধারণ করতে পারেনি। ফলে শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষা লাভের যে সনদ পায়, সেটি মানসম্মত কি না তা নিয়ে গভীর প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের লাখ লাখ বেকার উচ্চ শিক্ষার্থীর কারণটিও অনুসন্ধান করলে মানহীন এবং অপরিকল্পিতভাবে উচ্চশিক্ষার তথাকথিত শিক্ষার ব্যবস্থাটি অনেকাংশে দায়ী। এর ওপর নতুন নতুন সরকারি ও বেসরকারি কলেজ, মাদরাসা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে, অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থীর জন্য অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। নানা রকম অবৈধ্য সুযোগ-সুবিধা শিক্ষার্থীদের দেওয়া হচ্ছে। পড়ালেখার মান বৃদ্ধি করার চেষ্টা ও সুযোগ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেই। এ অবস্থায় আমরা প্রায়ই মানসম্মত উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের কথা শুনি, প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়, বিশ্বব্যাংকসহ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থার ঋণও তাতে দেওয়া হয়। কিন্তু বাস্তবে এর প্রতিফলন ঘটে না। আসলে এভাবে ঘটবে বলেও মনে হয় না। তবে উচ্চশিক্ষায় মান উন্নয়ন ঘটানো অবশ্যই সম্ভব, সে জন্য আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চশিক্ষার মান, করণীয়, শিক্ষাক্রম অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, গবেষণা ও পাঠদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের কোনো বিকল্প নেই।

বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষাকে বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের অপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠানে যেভাবে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে পরিচালিত হতে দেওয়া হয়েছে, সেটি সবার আগে পুনর্মূল্যায়ন করতেই হবে। আমাদের প্রকৃত অর্থে উচ্চশিক্ষায় কোন কোন বিষয়ে কী ধরনের বিশেষজ্ঞ শিক্ষিত মানুষ প্রয়োজন রয়েছে তা নির্ধারণ করতে হবে। আগামী ৫০ থেকে ১০০ বছরে কোন কোন খাতে কী ধরনের বিশেষজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও দক্ষ অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন রয়েছে, তার একটি ধারণাপত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। যে কথাটি বলা প্রয়োজন তা হচ্ছে, আমাদের উচ্চশিক্ষা পরিকল্পনাটি হতে হবে দেশ, সমাজ ও বিশ্ববাস্তবতায় আমাদের অংশগ্রহণ ও ভূমিকা রাখার চিন্তা থেকে। কিন্তু এখন আমরা উচ্চশিক্ষার নামে যেসব শিক্ষাক্রম চালিয়ে যাচ্ছি এগুলোর বেশির ভাগই দেশের আর্থ-সামাজিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও অন্যান্য খাতের জন্য মোটেও প্রযোজ্য নয়। আমরা এমন অসংখ্য বিষয় কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসাগুলোতে পড়াই। যেগুলোর কোনো কর্মক্ষেত্র নেই। আবার সেগুলোতে শিক্ষার মানের রয়েছে ব্যাপক সংকট, তাতে গবেষণার বালাই নেই। আবার যেখানে গবেষণা আছে বলে দৃশ্যমান, সেগুলোর মানও ভয়ানক রকম প্রশ্নবোধক। ফলে আমরা কী পড়াচ্ছি, কেন পড়াচ্ছি, পড়িয়ে দেশ ও জাতির কী লাভ হবে, যাঁরা পড়ছেন তাঁরা কেন পড়ছেন, পড়ে কী করবেন–এর কিছুই কারো জানা নেই, স্পষ্ট কোনো ধারণাও নেই। অনেক কলেজে এমন সব বিষয়ে অনার্স অনুমোদন দেওয়া আছে, যেগুলো পড়াতে যোগ্য শিক্ষক দেওয়ার কোনো বিধানও নেই। আবার অনেক সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স প্রগ্রাম চালু রয়েছে, যা দেশের কর্মক্ষেত্রের চাহিদা এরই মধ্যে পূরণ করে বসে আছে। ফলে সেখান থেকেও অনেকেই বেকার হয়ে বের হয়ে আসছে। এখন যে কাজটি আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে তা হচ্ছে আমরা দেশের জন্য স্নাতক পর্যায়ে কী পরিমাণ শিক্ষার্থী পড়াব এবং তাদের কর্মক্ষেত্র কোথায় হবে, সেখানে কী ধরনের বিষয়জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে সেটি নিশ্চিত করা। বিশেষত স্কুল পর্যায়ে আমাদের প্রতিবছরই কয়েক হাজার শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া দরকার। স্কুল ও মাদরাসাগুলোতে দক্ষ, অভিজ্ঞ ও বিষয়জ্ঞানে সমৃদ্ধ শিক্ষক

নিয়োগে স্নাতক পর্যায়ে কারিকুলাম বিন্যস্ত করা আবশ্যক। তাহলে সেখান থেকে যাঁরা স্নাতক (পাস) বের হয়ে আসবেন, তাঁরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে কাজ করতে পারবেন। আবার দেশের প্রশাসনযন্ত্রেও তাঁদের বিষয়জ্ঞান প্রযুক্তির দক্ষতা, ভাষাদক্ষতা ইত্যাদি বিবেচনায় চাকরির ব্যবস্থা করা যেতে পারে। অন্যদিকে দেশে কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে প্রায় অভিন্ন মানসম্পন্ন শিক্ষাক্রম সম্পন্ন করার জন্য একই মানের শিক্ষক নিয়োগের বিধান কার্যকর করা বাঞ্ছনীয়। বর্তমানে আমাদের কলেজগুলোতে স্নাতক (সম্মান) বিষয়ে পাঠদানের জন্য যেসব শিক্ষক দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছেন তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার যথেষ্ট ব্যবধান রয়েছে। একই শিক্ষক কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক, স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াচ্ছেন। তাঁদের শিক্ষক হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা দ্বিতীয় শ্রেণি বা বিভাগ আবার বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে একজন শিক্ষক নিয়োগ পেতে কমপক্ষে তিনটি প্রথম শ্রেণি থাকতে হয়। শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতার এ ধরনের ব্যবধান রেখে উচ্চশিক্ষায় মানের আশা করা মোটেও সম্ভব নয়। প্রয়োজন হচ্ছে কলেজ পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষক হওয়ার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কর্মরত শিক্ষকদের একই মান তথা অভিন্ন হতেই হবে। তাঁদেরও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মতো পদোন্নতি এবং সুবিধাপ্রাপ্তিতে সমান অধিকার এবং এমফিল-পিএইচডির সুযোগ-সুবিধা থাকতে হবে। স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ে গবেষণার বাধ্যবাধকতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশে বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে জিপিএ গ্রেড নির্ধারিত হওয়ায় মেধার যাচাই-বাছাইয়ে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। একসময় দেশের অনেক বিষয়ে কালেভদ্রে দু-একজন প্রথম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতেন। তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতায় যোগদান করতেন। এখন গ্রেড পদ্ধতিতে কাদের আগের ব্যতিক্রমধর্মী মেধাবী উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ধরা হবে তা নিয়ে বেশ জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। এই সুযোগে অনেকেই উচ্চতর গ্রেডভুক্ত হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাচ্ছেন, যাঁরা সেভাবে দক্ষতা দেখাতে পারছেন না। এই সমস্যাটি প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন প্রকট হয়ে উঠেছে। খুব প্রাসঙ্গিক হবে যদি বলি উন্নত অনেক দেশেই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভালো ফল করার পরও সরাসরি কাউকে শিক্ষক পদে নিয়োগ দেওয়া হয় না। এমফিল-পিএইচডিতে গবেষণা সম্পন্নের পর বিশ্ববিদ্যালয় সব কিছু বিবেচনা করে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে থাকে। আবার অনেক দেশেই লেকচার দেওয়ার জন্য কমপক্ষে সহযোগী অধ্যাপক হতে হয়। এর আগে নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সেমিনার গ্রহণ কিংবা কোর্স ও টার্মপেপারসহ বিভিন্ন ধরনের গবেষণার দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শ্রেণি পাঠগুলো হয় খুবই অভিজ্ঞ শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত। সে তুলনায় আমাদের এখানে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় সবাই কোনো ধরনের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা ছাড়া নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং তাঁরাই স্নাতক (সম্মান) ও মাস্টার্স পর্যায়ে পাঠদান শুরু করেন। ফলে আমরা বেশ পিছিয়ে পড়া অবস্থান থেকেই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে বাধ্য হচ্ছি। আবার আঞ্চলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অভিজ্ঞ শিক্ষকের নিয়োগদান খুব একটা নেই। সেগুলো চলছে সদ্য পাস করা নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের দ্বারা। কলেজগুলোর অবস্থা সে তুলনায় অনেক পেছনে। সুতরাং সেগুলোতে মানসম্মত শিক্ষা ও গবেষণার আশা করা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। এ কারণে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষাক্রম পরিচালনায় অভিন্ন নীতিমালা, শিক্ষক নিয়োগ, গবেষণা ও সুযোগ-সুবিধার বিধান নিশ্চিত করা আবশ্যক হয়ে পড়েছে। তাহলেই আশা করা যায় দেশে উচ্চশিক্ষায় বর্তমানে যে মানের ভয়াবহ সংকট বিরাজ করছে তা থেকে উত্তরণের পথ সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উচ্চশিক্ষার ন্যূনতম পরিবেশকে আমাদের বিবেচনায় নিতে হবে। আমরা সেই সব দেশের ন্যূনতম পরিবেশ থেকে এখনো অনেক পেছনে পড়ে আছি। আবার বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই রয়েছে বড় ধরনের তারতম্য ও বৈষম্য। খুব বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজগুলোর শিক্ষার মানের সমতা আমাদের হয়তো চিন্তার খোরাক জোগাতে পারে। আশা করি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে দ্রুত চিন্তাভাবনা শুরু করবে।

লেখক : সাবেক অধ্যাপক

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

patwari54@yahoo.com

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com